সৈয়দ শামসুল হকের নাটক চতুষ্টয় : রাজনৈতিক ভাবনার রূপ

মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ*

[সারসংক্ষেপ : ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদল হয়। এই ক্ষমতা বদলের রাজনীতিতে জাতির পিতাসহ দুজন রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করা হয়েছিল। জাতির পিতাকে হত্যাসহ দেশের এই রাজনৈতিক অস্থিরতাকে শিল্পসাহিত্যের স্রষ্টারা উপেক্ষা করতে পারেননি। ১৯৭৫–১৯৮২ কালপর্বে সৈয়দ শামসুল হক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, *গণনায়ক*, *এখানে এখন*, এবং *নূরলদীনের সারাজীবন* শিরোনামে চারটি নাটক রচনা করেন। নাটক চারটির প্রথমটির প্রতিপাদ্য মুক্তিসংগ্রাম, দ্বিতীয়টির বিষয় ক্ষমতা দখলের লড়াই, তৃতীয়টি রচিত হয়েছে সদ্য স্বাধীন দেশে নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণির উত্থানকে কেন্দ্র করে এবং চতুর্থটির আখ্যানবস্তু কৃষকের জমি ও ফসলের অধিকার রক্ষার লড়াই। বর্তমান প্রবন্ধে এই চারটি নাটকের বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের রাজনৈতিক ভাবনার রূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।]

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫–২০১৬) নাটক লেখা শুরু করেন ১৯৭৫ সালে, যদিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে। নাটক নিয়ে কাজ শুরু করেন তাঁর সাহিত্য চর্চার শেষ পর্যায়ে এসে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত তাঁর লেখা চারটি নাটক নিয়ে নাট্যকারের রাজনৈতিক ভাবনা অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে এই সময়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পায় বাংলাদেশ, জাতিরাষ্ট্র হিসেবে এই পথ চলার পাশাপাশি যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধারা নাটক রচনা ও মঞ্চায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[১] ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবার হত্যা করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পঁচাত্তরের সামরিক অভ্যুত্থান আর পালটা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের দুজন সেক্টর কমান্ডার[২] মৃত্যুবরণ করেন। একই সময়ে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূচনা। ১৯৮১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন আরেক সেক্টর কমান্ডার ও তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ কালপর্বে সামরিক শাসনের সূচনা ও দুজন রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম দশ বছরে সৈয়দ শামসুল হক রচিত নাটকসমূহে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এবং রাজনীতির রূপ-সম্পর্কিত ভাবনা অনুসন্ধান করা যায়। নিজ রাজনৈতিক ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> ইতিহাস ও দেশ! অবিরাম কাজের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে– অগ্রসর মানেই তো শ্রান্তিহীন বিশ্লেষণ এবং পরের ক্ষেপে পা রাখা– এভাবেই আমরা বোধ করে উঠি যে প্রতিটি মানুষ, তিনি শিল্পী হোন বা না-ই হোন, যদি সচেতন তিনি অস্তিত্ব ও সময় সম্পর্কে, তবে তাঁর সে চেতনার অস্থি হয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং ইতিহাস-ধারণা। (শামসুল হক, ২০১৫ : ১১)

একই সঙ্গে বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং দেশবিরোধী রাজাকার ও আলবদরদের উত্থান তাঁকে ক্ষতাক্ত করেছে। তিনি এই রাজনৈতিক পালাবদলের বিপরীতে নিজ লেখাকেই শক্তিশালী করেছেন (শামসুল হক, ২০১৫ : ১৩–১৯)।

* প্রভাষক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

সৈয়দ শামসুল হক কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি কবিতা ও নাটকের মিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলাদেশের কাব্যনাটকের ভূমি নির্মাণ করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যনাটকসমূহ হচ্ছে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৫)[৩], *গণনায়ক* (১৯৭৬)[৪] *এখানে এখন* (১৯৮১)[৫] *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২)[৬], *ঈর্ষা* (১৯৯০)[৭], *নারীগণ* (২০০৭)[৮] ও *উত্তরবংশ* (২০০৮)[৯]। সৈয়দ শামসুল হক রচিত প্রথমদিকের চারটি নাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, *গণনায়ক*, *এখানে এখন* এবং *নূরলদীনের সারাজীবন*–এর বিষয় নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হবে।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কাব্যনাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে। যেখানে সতেরো গ্রামের সাধারণ মানুষ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধার আক্রমণ শঙ্কায় ভীত। এই গ্রামের মানুষকে একদিন মাতবর বলেছিলেন এই দেশকে মুক্তিবাহিনী তুলে দিতে চায় শত্রুর হাতে। তাই মুক্তিযোদ্ধা আসার খবরে তারা জানায়–

> লোকের চক্ষের ঘুম বন্ধ হয়া গ্যাছে
> খ্যাতের উপর দিয়া লু-হাওয়া উড়ায়া নিতাছে
> অনেকেই কইতাছে
> আসে ঐ মুক্তিবাহিনী পুব দিক দিয়া
> যমুনা সাঁতার দিয়া (শামসুল হক, ২০১৫ : ১৮)

পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থানের পেছনে তাদের নগদ সুবিধা ও প্রাপ্তির বিষয় ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই গ্রামের মানুষ মাতবরের নির্দেশে বিরোধিতা করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের। মাতবরকে তারা বলে–

> আপনের হুকুম মতো এই সারা সতেরো গেরামে
> কোনোদিন কোনো ব্যাটা মুক্তিবাহিনীর নামে
> আসলেই খেদায়া দিছি যেমন ভিটায়
> খা খা কাক ডাকলে দুপুর বেলায়
> লাঠি হাতে বৌ-ঝি খেদায়। (শামসুল হক, ২০০৫ : ১৯)

নাট্যকার এই গ্রামের মানুষের একাংশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তবে গ্রামের অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বজন মনে করেছেন। গ্রামবাসী জানায় মুক্তিযোদ্ধারা নিজের সন্তান, ভাই হলেও তারা তাদের ত্যাগ করেছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় গ্রাম থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে একটি অংশ। গ্রামবাসী দুইভাগে বিভক্ত, একভাগে পাকিস্তানপন্থি আর অপরপক্ষে স্বাধীন দেশ আনার স্বপ্নে লড়াই করা মুক্তিযোদ্ধারা। এই মুক্তিযোদ্ধার দলে মাতবরের কন্যার হবু স্বামী মাস্টারও আছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহায়ক মাতবরের কাছে গ্রামবাসী নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রার্থনা করে, "সহজ কথায় এই দুনিয়ায় জীবিত থাকতে চাই" (শামসুল হক, ২০০৫ : ২২)। মাতবর গ্রামবাসীকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা কাছেই আছে। তিনি জানিয়ে দেন গ্রাম, গঞ্জ আর বাজারে পাকিস্তানি বাহিনী বন্দুক আর কামান নিয়ে প্রস্তুত তাদের হাতেই মুক্তিবাহিনীর বিনাশ। গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "পিঁপড়ার মতো মারা যাবে মুক্তিবাহিনী তোমার" (শামসুল হক, ২০০৫ : ৩৭)। গ্রামবাসী তার এই কথায় বিশ্বাস রাখতে পারে না। তারা পাশে দেখতে পায় না পাকিস্তানি সৈন্যদের। তখন মাতবর জানান পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন গতকালও তার বাড়িতে এসেছিলেন।

মাতবরের নিজের কন্যার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের বিয়ে এবং মাতবরের মৃত্যুতে পাঠক-দর্শক তাঁর প্রতি করুণা অনুভব করে। মাতবর যদিও কন্যার বিয়ে নিয়ে সংশয়ে ভোগেন, আশা স্রষ্টা এই বিয়েকে কবুল করবেন। তিনি গ্রামবাসীকে জানান, 'আমি তার হাতে নিজেই আল্লার নামে দিয়াছি মেয়েরে' (শামসুল হক, ২০০৫ : ৪৫)। বাঙালি মুসলমানের বিয়ের প্রচলিত রীতি অনুসরণ করা হয়নি এখানে। শুধু তাই নয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আসলে বিয়েই করতে চাননি। তিনি শুধু ভোগ করতে চেয়েছেন মাতবর কন্যাকে। অসহায় বাবা বিয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এই বলে যে, বিয়ের তথ্য জানবে দুটি পক্ষ আর কেউ নয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সহায়তা করার পরও মাতবরের কন্যাকে ভোগ করতে সেই বাহিনীর একজন সদস্য তাঁকে হুমকি দেয় বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার, বাড়িতে রক্তের নদী বইয়ে দেওয়ার। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত, "মাতবরকে হত্যা করা হলেও তার রাজনৈতিক জীবনের অসহয়াত্বে দর্শকের মনে তার প্রতি কিছুটা করুণা ও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়" (অনুপম, ২০১০ : ১৩৭)। কেননা মেয়েকে ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দেবার বর্ণনা অংশে তিনি বলেন, "সোনার পুতুল আমি এইভাবে সাগরে ভাসাই।" (শামসুল হক, ২০০৫ : ৪৯) একইসঙ্গে তিনি চেয়ারের পিঠে মাথা নামিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন। এই কান্না এক অসহায় পিতার কান্না, যিনি নিজের কন্যাকে রক্ষা করতে পারেন না। মাতবর কন্যা ধুতরার বিষ খেয়ে পিতার সামনে আত্মহত্যা করেন। পিতা মৃত মেয়ের লাশ লক্ষ করে গ্রামবাসীকে বলে—

> ফিরা আয়, ফিরা আয় মা-রে।
> তোমরা কেউ যাইতে দিও না অরে।
> (শামসুল হক, ২০০৫ : ৫৫)

মাতবরকে হত্যার মুহূর্তে তিনি জানান যে গ্রামের সব মানুষ তাঁর আপনজন। শুধু তাই নয় সদ্য কন্যাহারা মাতবর জানান যে তার আর কিছুই নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা সতেরো গ্রামের মাতবর এখানে পাঠক-দর্শকের সহানুভূতি লাভ করেন। এ বিষয়ে নাট্যকারের ভাষ্য—

> একজন যখন পাপ করে এবং পাপের শাস্তি হিসেবে সে যখন দোযখে যাবে, ভাবার কোনো কারণ নেই যে ঈশ্বর তাকে হেসে হেসে দোযখে পাঠাবে। ঈশ্বরের অবশ্যই মায়া হবে, কারণ তার সৃষ্টির তো এমন হওয়ার কথা ছিল না। যেহেতু হয়ে গেছে তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাজা দিতে হলো। তো আমি যখন লিখি তখন তো আমি ঈশ্বর। একেকটা চরিত্র সৃষ্টি করছি। আবার যখন দর্শক দেখে তখন কিন্তু সে-ও একজন ঈশ্বর। (বিপ্লব ও হাসান, ২০০৬ : ২৯—৩০)

তাঁর এই ভাবনা প্রমাণ করে যে প্রতিটি মানুষের জীবনের গুরুত্ব আছে। এখানে জীবনের প্রতি দায় পালন করেন নাট্যকার। মাতবর মৃত্যুর আগেও তার অপরাধকে চিরায়ত হিসেবে জনতার সামনে উপস্থাপন করেন এই বলে—

> না হয় জালেম আমি, কও দেখি একবার
> বুকে হাত দিয়া কও, জালেম কি জন্মাবে না আর?
> কোনো দেশে? কোনো বংশে? আবার? আবার?
> আমার জীবন নিয়া তবে কও কি হবে তোমার? (শামসুল হক, ২০০৫ : ৫৬)

যদি মাতবরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অত্যাচারের পতন হয় তবে সে মৃত্যুতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু যে কোনো দেশে, যে কোনো সমাজে আবার তার মতো আরেকজনের জন্ম যদি হয় তবে

আর তাকে হত্যা করে কী ফল হবে? নাট্যকার এখানে অত্যাচারী জন্ম নেওয়ার পথ বন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।

প্রসঙ্গত লেখা যায় যে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতিকে একটি ভূখণ্ডই দেয়নি এর সঙ্গে জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। সেই মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে একটি গ্রামের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অবস্থান নিয়েছে। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধ। এ ধরনের যুদ্ধের ক্ষেত্রে গেরিলাদের শক্তি হলো স্থানীয় জনগণ। একটি প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে গণমানুষের লড়াই। একদল অস্ত্র হাতে লড়াই করেছে, তাদের পাশে থেকে অভয় দিয়েছে কেউ, আবার কেউবা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছে। এমনি করেই এদেশের সাধারণ মানুষের লড়াই হয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। আলোচ্য নাটকে পুরো গ্রাম পাকিস্তানিদের সহায়তা করেছে। যার নেতৃত্ব দিয়েছেন মাতবর। ফলে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের ক্ষেত্রে সংশয় তৈরি হয়। এই সংশয় সমাধান করেন নাট্যকার এই বলে, "দেখো আমার ওই নাটকের কোথাও 'রাজাকার; বা 'একাত্তর' শব্দ নেই। তারপরও মানুষ ভাবছে এটা মুক্তিযুদ্ধের নাটক। আমার মনে হয় ৩০/৪০ বছর পর যদি দর্শক দেখে তখন বলবে– এন্টিপিপলকে হিরো বানিয়েছি।" (বিপ্লব ও হাসান, ২০০৬ : ৩০)

নাট্যকারের বক্তব্য থেকে লেখা যায়, বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম এখানে অনুপস্থিত। বরং নাটকটিতে মাতবরের প্রতি দর্শকের করুণা হয়। পাকিস্তানিদের সহচর নিজ গ্রামেই কবর চান। তাঁর এই কবর প্রার্থনা দর্শক-পাঠক চিত্তে চরিত্রটির প্রতি মমত্ববোধ তৈরি করে। এই নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেন, "এই নাটকে মাতবরের বুকফাটা কান্নায়, তার অপমানিত আর্তিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি বিশেষ প্রান্ত হয়েছে উন্মোচিত। কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে রচিত এই নাটক আঞ্চলিক শব্দের নিপুণ ব্যবহারে যুদ্ধকালীন উত্তর বাংলার গ্রামীণজীবনকে যেন শব্দবন্দি করে ধরে রেখেছে। ভাষার গীতময়তা, আঞ্চলিক শব্দের কুশলী প্রয়োগ এবং যুদ্ধকালীন জীবনবাস্তবতার কাব্যিক উচ্চারণে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি পালাবদলকারী নাটক হিসেবে বিবেচিত।" (বিশ্বজিৎ, ২০০৩ : ৭০) নাটকের শেষ অংশে হত্যা করা হয় মাতবরকে। এই হত্যার পরপরই পাইক জানিয়ে দেয় 'বড় শয়তান'কে শেষ করা হয়েছে 'ছোটখাটো' আছে তাদের সন্ধানে নামতে হবে। নাটকের শেষে বর্ণনা করা হয় অধিকৃত বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের নির্যাতনের খবর–

দেখাইয়া দেই সব কোথায় কখন
কি গজব কি আজাবে ছিল লোকজন
জালেমের হাতে ছিল যখন শাসন
শত শত মারা গেছে আত্মীয় স্বজন
এদিকে, সব আসেন এখন
দেখাইয়া দেই সব কি ভাবে কখন
মেলেটারি ঘাঁটি নিয়া ছিল কয়জন
কারা সঙ্গে ছিল তাদের তখন
অবিলম্বে সারা দেশ ঘেরা প্রয়োজন
জলদি জলদি সব চলেন এখন।

(শামসুল হক, ২০০৫ : ১২৩)

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে মুক্তিযুদ্ধকে সৈয়দ শামসুল হক ভিন্ন এক মাত্রা থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ক্ষমতার সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষের টিকে থাকার চিত্র এঁকেছেন। মাতবরের ভয়ে গ্রামবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয় না। আবার মাতবর পাকিস্তানিদের সহায়তা করলেও পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের কাছে অসহায় হয়ে যায়। তিনি সে সামরিক কর্মকর্তাকে মেয়েকে ধর্ষণের সুযোগ দেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে তিনি ভিন্নতর দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই নাটককে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নাটক নয় সার্বিক মুক্তির নাটক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে এই নাটক প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> এই সময় '৭৩ সালে সেপ্টেম্বর মাস, মতিঝিল বাংলাদেশে ব্যাংকের সামনে দেখি একটা বাচ্চা ছেলে লোহার শিক দিয়ে এক বৃদ্ধকে খোঁচাচ্ছে আর বলছে— তুই ব্যাটা রাজাকার। এবং সেটা বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। ... এবার তোমরা বল যে, আমি যদি এই দেশের লোক না হই, আমি যদি না জানি যে এই দেশে যুদ্ধ হয়েছিল বা ধরো আমি যদি নাইজেরিয়ার লোক হতাম তখন এই দৃশ্য দেখে আমার কী মনে হতো? সত্যিই এই দৃশ্য আমি ভুলতে পারি নি। এবং এটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই আমার মনে হলো আসলে পুরো ব্যাপারটা ছিল, মানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা ছিল ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি। অথচ ঐ মুক্তিটা তো কেবল রাজনৈতিক মুক্তি ছিল না। ... তো এটা '৭৩ এ ভাবলাম, '৭৪ এ ভাবলাম এবং '৭৫ এ এসে আমার মনে হলো এই বিষয়টাকে যদি আমি কমিউনিকেট করতে চাই তাহলে কবিতা লিখলে চলবে না, কবিতা লিখলে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে থেকে যাবে। গল্প লিখলেও অল্প কয়েকজন পাঠক পড়বে, উপন্যাসও তাই। তখন আমার মাথায় এলো এই বিষয়টাকে নাটকের মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে। তখনই, মানে '৭৫ এর মে মাসে আমি লিখে ফেললাম পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। এই নাটকটিকে লোকে যখন বলে মুক্তিযুদ্ধের নাটক আমি তখন চুপ করে থাকি ... কারণ, আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে অনেক বড় মুক্তির কথা এখানে বলা হয়েছে। (বিপ্লব ও হাসান, ২০০৬ : ২৯)

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকটি আর তখন কোনো একটি ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তিসংগ্রামের নাটক থাকে না। বরং সারা পৃথিবীর মানুষের মুক্তির দলিল হয়ে যায়।

উত্তরাঞ্চলে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহের নায়ক নূরউদ্দীনকে[১০] কেন্দ্র করে রচিত নাটক *নূরলদীনের সারাজীবন*। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক বলেন, "নিজেকে দেয়া অনেকগুলো কাজের একটি এই যে, আমাদের মাটির নায়কদের নিয়ে নাটকের মাধ্যমে কিছু করা, 'নূরলদীনের সারাজীবন' লিখে তার সূত্রপাত করা গেল। যে জাতি অতীত স্মরণ করে না, সে জাতি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না।" (শামসুল হক, ২০০৫ : ৬১) [২৭] নাটক লেখার প্রেক্ষাপট নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে ভূমিতে তাঁর জন্ম সে ভূমির মানুষের কথা জানার আগ্রহ হয়। বিবিসির লাইব্রেরিতে পাঠ করতে করতে বিদ্রোহী নূরলদীনকে খুঁজে পান, আর জানতে পারেন ১৭৮৩ সালে এই বিদ্রোহী সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।[১১] তাঁর ভাবনায় নূরলদীন শুধুমাত্র সে সময়ের বিদ্রোহী হয়ে থাকেনি, বরং সকল সময়ের লড়াই সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে ভেবেছেন। একই সাক্ষাৎকারে তিনি জানান—

> রংপুরে তখনকার কালেক্টর ছিলেন গুডল্যাড— আমার নাটকেও একটা চরিত্র আছে। তো এইগুলো পড়ছি কিন্তু তখনো জানি না যে নাটক লিখবো। কালেক্টর গুডল্যাড তার নিজের হাতে রিপোর্ট লিখেছিল, তাতে লিখেছে— এই ডেকোইটস ... দেখলাম তখন যাদের ডেকোইটস বলা হতো, পাকিস্তানীরা পরে তাদের মিসক্রিয়েন্ট বলতো। আমরা ওদের বলি বিপ্লবী। তখনকার শাসকদের ভাষায় ছিল ডেকোইটস। তো লিখেছে— ডাকাত দলে অর্থাৎ নূরলদীনের দলে মাদ্রাসা-মক্তব টোলের ছাত্ররা, জেলে-কামার-কুমারেরা যোগ দিয়েছে। প্যারালাল টু ১৯৭১ এ কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা, ওখানে জেলে-কামার-কুমার আর এখানে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ, কী আশ্চর্য মিল দেখো। ওয়ারেন হেস্টিংস যে মার্শাল 'ল জারি করেছিল তা এই নূরলদীনের আপরাইজিং-এর পরে। তার সঙ্গে আবার

ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের মিলিটারী ফর্মানের আশ্চর্য মিল পাবে ... তো এই যে প্যারালাল সিমিলারিটি, এটা আমাকে খুব টেনেছিল এবং ভাবিয়েছিল। (বিপ্লব ও হাসান, ২০০৬ : ৩০)

নূরলদীন নাট্যকারের কাছে আর তখন কৃষক বিদ্রোহের নায়ক নয়; উত্তরকালে বাংলার সংকটের সময় প্রতীক হয়ে এসেছে। ১৯৮২ সালে ঢাকায় বসে তিনি এই নাটক লেখা সমাপ্ত করেন। আমরা যদি সে সময়ের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করি তবে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জাতীয় সংসদ বাতিল ও সংবিধানকে রহিত করে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করা হয়। নাটক রচনাকালে এই ভাবনা নাট্যকারের ছিল, তাই প্রস্তাবনা অংশে সূত্রধার বলেন—

আবার বাংলায় বুঝি পড়ে যায় মনে,
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়; (শামসুল হক, ২০০৫ : ৬৩)

বাঙালির সংগ্রামের এক ঐতিহ্যময় ঘটনাকে নাটকের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন নাট্যকার। ইতিহাস ও তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনার[১৯] অন্বয়ে তিনি বাঙালি জাতিসত্তার সংগ্রামী চেতনা ও দখলদারদের বিরুদ্ধে যূথবদ্ধ প্রতিরোধকে চিত্রিত করেছেন। এখানে জাতীয়তাবাদী চেতনায় জারিত হন নাট্যকার। যেখানে রূপময় প্রকৃতি আর ভূগোল একটি বিন্দুতে স্থিরীকৃত হয়—

পুন্নিমার চান বড় হয় ধবল।
জননীর দুগ্ধের মতন দ্যাঁখো রোশনাই।
... ...
এ দ্যাশে হামার বাড়ি উত্তরে না আছে হিমালয়
উয়ার মতন খাড়া হয় য্যান মানুষেরা হয়।
এ দ্যাশে হামার বাড়ি দক্ষিণেতে বংগোপসাগর,
উয়ার মতন গর্জি ওঠে য্যান মানুষের স্বর।
এ দ্যাশে হামার বাড়ি পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র আছে,
উয়ার মতন ফির মানুষের রক্ত য্যান নাচে।
এ দ্যাশে হামার বাড়ি পশ্চিমেতে পাহাড়িয়া মাটি
উয়ার মতন শক্ত হয় য্যান মানুষের ঘাঁটি।
(শামসুল হক, ২০০৫ : ৬৪৭)

দৈহিক মৃত্যু হয় নূরলদীনের কিন্তু তার আদর্শের সংগ্রাম বাহিত হয় উত্তর প্রজন্মের মাধ্যমে। ফলে নূরলদীন কৃষক বিদ্রোহের নেতা নন বিপ্লবী আদর্শের প্রতীক হয়ে যায়, সূত্রধার নাটকে বলেন—

অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
দিবে ডাক, 'জাগো বাহে, কোনঠে সবায়?'
(শামসুল হক, ২০০৫ : ৫৭০)

কৃষক বিদ্রোহের নেতা রূপান্তরিত হন জাতীয় বীরে। জাতি হিসেবে বাঙালি দীর্ঘ এক পথ পরিক্রমা করেছে। সেই সংগ্রামী পথ সম্পর্কে নাট্যকার সচেতন, "আমি আজকের যোদ্ধা নই, আমার একটা ঐতিহ্য আছে। আমরা যে ন'মাসের যুদ্ধ করেছি, সেটারও একটা পূর্ব ধারাবাহিকতা আছে।" (বিপ্লব ও হাসান, ২০০৬ : ৩০) একইসঙ্গে এই সংগ্রামের বিশ্লেষণধর্মী রূপও মিলে নাটকে। এ কারণে বিষয় বিবেচনায় নাটকটিকে ঐতিহ্যের রূপায়ণ এবং বিশ্লেষণ বলা যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যে মৃত নূরলদীন রক্তাক্ত চাদর গায়ে মঞ্চে জীবিত হয়ে ওঠে। কোনো কোনো সমালোচক একে বাহুল্য বলে বিবেচনা করেছেন।[১৩] নূরলদীনের জীবিত হওয়া ব্যক্তির জীবিত হওয়া নয়, আদর্শের জীবিত হওয়া। যে চিন্তন কৃষক বিদ্রোহের নেতা বুনে দিয়েছেন সেই চিন্তনকে তার অনুসারীরা বহন করবে। তাই তিনি দলের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন মোগলহাটে যুদ্ধে যাবার আগে বলেছিলেন, 'হামার মরণ হয়, জীবনের মরণ যে নাই' (শামসুল হক, ২০০৫ : ৭১) [৩৬]। তাই মৃতের জীবিত হওয়া তখন আর ব্যক্তির জীবিত হওয়া থাকে না। আবার যদি প্রাচ্য নাট্যরীতি অনুসারে বিবেচনা করা হয় তাহলে নূরলদীনের মঞ্চে জীবিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কেননা এ ধারার নাট্যচর্চায় দর্শককে সকল সময় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তারা থিয়েটারেই আছেন। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যরীতিতে দর্শকের সম্মুখে নাট্য উপস্থাপনে পালাকার/গায়েন দর্শককে মনে করিয়ে দেয় যে তারা পরিবেশনার দর্শক। নাটকে কোরাস ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখার পাশাপাশি প্রতিপক্ষ হিসেবে মুখোমুখি দাঁড়ায়। দুই কোরাসের মুখোমুখি লড়াই কবিগানের[১৪]। আধুনিক রূপ বলা যেতে পারে। পুরাণের বদলে সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র কয়ে দুটি পক্ষ মুখোমুখি। প্রথম দৃশ্যে নুরুলদীনের অনুসন্ধানের কালে ইংরেজ পক্ষের নীলকোরাস জানায়, নূরলদীন নেই অন্যপক্ষে লালকোরাস জানায় আছে তাদের নেতা (শামসুল হক, ২০০৫ : ৬৫–৭০)।

ঋণচক্রের কথা বলে নূরলদীন তার সাথীদের লড়াইয়ে উদ্দীপ্ত করে। তিনি জানিয়ে দেন নবাবী শাসন চলে যাবার পর বাংলার কৃষকের জন্য খারাপ সময়ের সূচনা হয়েছে। নগদ টাকার খাজনা দিতে গিয়ে কৃষক ধান ও পাট বিক্রি করে মহাজনের নির্ধারিত মূল্যে। তারা কৃষকের কাছ থেকে জমি, বলদ ঋণের নামে কেড়ে নেয়। দলের লোকদের কাছে এর বর্ণনা দেয় নূরলদীন–

> একদিন টাকায় টাকা সুদ স্বীকার করি মহাজনের ঘরোতে গেইলোম,
> কর্জ শোধ করিবার না পাই বলিয়া জমি লিখিয়া দিলোম,
> ঘটি বাটি লাঙল বলদ মই বিক্রি করিলোম,
> বাপ হয়া বিক্রি করিলোম ব্যাটা, স্বামী হয়া ইস্তিরি, যুবতী কন্যা নিলো কাড়ি
> জংগলে পলেয়া গেইলোম, গোরস্তান শ্মশান হয়া গেইল হামার বাপোদাদার বাড়ি,
> হামার নিজের ভিটা, নিজের মাটি চলি গেইল শয়তানের দখলে।
>
> (শামসুল হক, ২০০৫ : ৯৮)

কৃষক তার জমি ও অন্যান্য সম্পদ নয়, সন্তান বিক্রি করে। বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে আশ্রয় নিতে চায় কোম্পানির কাছে। জমিদারের অত্যাচার ও মহাজনের চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে রক্ষার এবং নীল চাষ থেকে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কৃষক আবেদন করে। এই বিদ্রোহের বীজ ইংরেজ শাসনের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে। আবেদনে কোনো কাজ না হলে কৃষকেরা ঠিক করে, যে ভূমিতে তার জন্ম সেই ভূমি আর যে ফসল সে জন্মায় তাতে আর কারো অধিকার নেই। ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তার লড়াই অনিবার্য হয়ে যায়।

নাট্যকার এখানে আন্দোলনের বিশ্লেষকের ভূমিকা পালন করেন। ঘটনার নায়ক নূরলদীন লড়াই করবে, বিজয় ছিনিয়ে আনবে– এখানেই তিনি নাটকের বিষয় কাঠামো নির্ধারণ করেননি। বরং দ্বান্দ্বিকভাবে নূরলদীনকে দেখেছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "নূরলদীন যতটা না বীরগাথা, তার চেয়ে বড় হচ্ছে ক্ষমতা মানুষকে নষ্ট করে কি করে না? বা কীভাবে করে?" (বিপ্লব ও হাসান, ২০০৬ : ৩১)। নূরলদীন এই সংকটে নিজের সাথে লড়েছে, তার ছায়া আব্বাসের সাথেও লড়েছে। তার স্ত্রী আম্বিয়া হতে চেয়েছে রাণি। এমনকি আম্বিয়া যখন তার কাছে আগুণ পাটের শাড়ি[১৫] চায় তখন ক্রোধে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরে যায় সে। তবে আব্বাস বুঝতে পারে কৃষক বিদ্রোহের এই নায়কের ভেতরে ক্ষমতার আশা ভর করেছে। মানুষের আশা সম্পর্কে সে স্পষ্টই বলে, "উয়ার অন্তর কেহ পারে নাই করিতে জরীপ" (শামসুল হক, ২০০৫ : ১১০)। নূরলদীনের ভেতরে নবাব ও নেতার দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে যায়, দ্বাদশ দৃশ্য থেকে যেখানে দিনাজপুর, রংপুর, কুচবিহার, আসাম থেকে আসা কৃষকেরা তাঁকে 'নবাব' হিসেবে অভিহিত করে। আব্বাস তখন নূরলদীনকে তার নিজের আগের উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষক নেতা জবাবে বলেন যে তিনি নবাব হতে চান না। সব সিংহাসনে আগুন দেওয়া হয়েছে, মানুষ পরস্পরের কাছে মানুষ পরিচয়ে আসছে। সুখে-দুঃখে সবাই একসাথে আছে এমন আশা নিয়েই তাঁর অপেক্ষা। সবশেষে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা জানায় নূরলদীন, "সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশেই আছে" (শামসুল হক, ২০০৫ : ১৪০)।

জনগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই নূরলদীন যুদ্ধের আহ্বান জানান। তার দলে নানা অঞ্চল থেকে আসা জনগণ যোগ দিয়েছে, এই জনতার শক্তিতেই তিনি যুদ্ধের ডাক দেন। নাট্যকার তার চরিত্র নির্মাণের জন্য ইতিহাস থেকে তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্য দিয়ে নতুন এক সত্যে উপনীত হতে চেয়েছেন। নূরলদীন সে সময়ে একটি অঞ্চলে প্রায় ৩৫ হাজার লোকের বাহিনীর নেতা।[১৬] সংখ্যা বিচারে কম নয় যা তাকে সাহসী করে তুলেছিল। একইসঙ্গে তার সাথে আসা বিদ্রোহীরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই আক্রমণ করেছেন। বড়ো বাহিনীর নেতা হিসেবে তার মাঝে অহংবোধ তৈরি হয়েছে। সেই অহংবোধই তাকে অপ্রস্তুত একটি বাহিনী নিয়ে লড়াইয়ের দিকে নিয়ে গেছে। কিন্তু জনগণের প্রতি বিশ্বাসের ঘাটতি হয়নি নূরলদীনের, তাই যুদ্ধের সময় নেতা হিসেবে প্রত্যাশার কথা জানায় আব্বাস আর তার প্রিয় বিদ্রোহী জনগণকে–

এক এ নূরলদীন যদি চলি যায়,
হাজার নূরলদীন আসিবে বাংলায়।
এক এ নূরলদীন যদি মিশি যায়,
অযুত নূরলদীন য্যান আসি যায়,
নিযুত নূরলদীন য্যান বাঁচি রয়।
(শামসুল হক, ২০০৫ : ১৪৩)

নূরলদীনের লড়াই বিজয় কিংবা পরাজয়ে শেষ হয়ে যায়নি। বরং লড়াইয়ের নতুন আহবানে জাগ্রত হয়। যেখানে আব্বাস বলে–

: ধৈর্য সবে– ধৈর্য ধরি করো আন্দোলন।
লাগে না লাগুক, বাহে, এক দুই তিন কিম্বা কয়েক জীবন।
(শামসুল হক, ২০০৫ : ১৪৪)

কৃষক বিদ্রোহে এই আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে না, গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে। সেটা কত সময় ধরে ঘটবে তা গুরুত্ব রাখে না। আব্বাস সময়ের হিসেব না করে আন্দোলনকে অগ্রসর করার আহ্বান জানান। পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে লড়াইয়ের যে ডাক আব্বাস দেয়, 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবেশের মধ্য দিয়ে সে আন্দোলন জয় পায়। কৃষক বিদ্রোহের পথ বেয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম। ফলে দুটি নাটক সংযুক্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে জিয়া হায়দার লিখেন—

> : In 'Nurul Deen', Syed Haq has taken a bigger canvas dramatizing the past : the peasant revolt in Rangpur in the sixth decade of the eighteenth century against the British and it's devert. In a sense 'Nurul Deen' is a prelude to 'payer Awaz' though it was written later. Clearly, he wanted to show the continuity of our freedom struggle against colonialism and foreign occupation. (Zia, 1996 : 287)

গণনায়ক রচিত হয় জুন ১৯৭৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৯৬) নাট্যকার এই নাটককে 'রাজনৈতিক বিবেকের পালা' (শামসুল হক, ২০০৫ : ২২১) বলেছেন। নাটকটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪–১৬১৬) রচিত 'জুলিয়াস সিজার' দ্বারা অনুপ্রাণিত। এ বিষয়ে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেন, "অনুসন্ধিৎসু পাঠক লক্ষ্য করবেন, অনুবাদ আমি করিনি, রূপান্তরিত রচনাও একে বলা যাবে না; আমি বরং বহু পূর্বে গত এক অগ্রজের সঙ্গে বসে সচেতনভাবে নতুন একটি রচনায় হাত দিয়েছি।' (শামসুল হক, ২০০৫ : ২২১) নাট্যকার সচেতন ছিলেন একটি নতুন নাটক রচনায় যেখানে নাট্যকারের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত থাকবে। তাই নাটকটি তাঁর রাজনীতিবিষয়ক ভাবনার প্রতিফলন। এই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি ওসমানের হত্যা ও তৎপরবর্তী ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে। নাটকের রচনাকাল বিবেচনায় বলা চলে ৭৫-এর রাজনৈতিক হত্যা এখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি। তবে সদ্য স্বাধীন দেশে জনপ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের পটভূমিতে এই নাটক রচিত হয়েছে মূলত ইতিহাসের পরম্পরাকে বিবেচনা করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে।

রাষ্ট্রের নামে যে দায়িত্ব পালন করা হয় তাতে রাষ্ট্রের চেয়ে ক্ষমতায় থাকা মূল ব্যক্তিকে নিরাপদে রাখাই প্রধান। তাই মন্ত্রী আলাপনে জানায় আড়িপাতা হয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নয়, ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য। এই কাজের জন্য রাষ্ট্রের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। আর রাষ্ট্রকেই সামনে রাখা হয়। এ বিষয়ে নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন—

> ... এইই হয়, প্রথমত মনে হয়, রাষ্ট্রের
> কল্যাণেই করা, পরে দেখা যায়, রাষ্ট্রের চেয়ে বড় হয়েছে
> ব্যক্তি, সমস্ত উদ্যমের লক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে সেই ব্যক্তিটির
> প্রতিষ্ঠা রক্ষা।
>
> (শামসুল হক, ২০০৫ : ২২৩)

গণনায়ক নাটকের রচনাকাল জুন ১৯৭৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, এ সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার বদল ঘটে। সপরিবারে হত্যা করা হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরপরই বাংলাদেশে সামরিক শাসন শুরু হয়। নাটকে বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় নেতাকে হত্যা করে তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা। তারপর থেকে বিশ্বাস ভঙ্গ আর রাজনীতির নানা বাঁক পেরিয়ে নাট্যঘটনা অগ্রসর হয়। পাঠক-দর্শক মনে এমন

ধারণা হতে পারে নাটকে আগস্ট হত্যাকাণ্ড বিম্বিত। 'সবিনয় নিবেদন' অংশে নাট্যকার জানিয়ে রাখছেন রচনার প্রেক্ষাপট "আমার ভাষায় আমার পাঠক এবং দর্শককে ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যের সংবাদ দেবার জন্যই বঙ্গদেশীয় পটভূমি আমাকে ব্যবহার করতে হয় গূঢ় কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়।" (শামসুল হক, ২০০৫ : ২২১) নাটকের ঘটনাকাঠামোর সঙ্গে আগস্ট হত্যাকাণ্ডের তুলনামূলক আলোচনায় বলা যায়, ইতিহাসে রাষ্ট্রপ্রধানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে নাটকে গণনায়কের বিধবা পত্নী সামরিক বাহিনীর শিখণ্ডী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন।

গণনায়ক নাটকে তিনি রাজনীতিতে জনগণের প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন। যুক্তির চেয়ে আবেগই এই জাতির শক্তি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই তো সিকান্দার বলে—

> নদী যেমন প্রবল বেগে দক্ষিণের দিকে ধাবমান,
> বাংলার জনগণও রাজধানী ঢাকার দিকে,
> নৌকায়, ট্রেনে, বাসে, অবস্থাপন্নরা বিমানে।
> উদ্দেশ্য জেনারেল আজমকে একবার দেখা।
> সংগে ছিল কৃষকের অসময়ের ফল, বৃদ্ধের
> সঞ্চিত সম্বল, ব্যবসায়ীর সোনার মোহর।
> উদ্দেশ্য জেনারেল আজমকে নজরানা। আর আজ?
>
> (শামসুল হক, ২০০৫ : ২২৪)

ওসমানের জনপ্রিয়তা ও পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসকদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধার তুলনামূলক পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে সংলাপে। রাজনীতিবিদগণ সকল সময়ে জনতার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। জনতা নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নেয় না। তাই নাটকে গণনায়কের মৃতদেহকে সম্মুখে রেখে রশীদ আলির আবেগপ্রবণ বক্তৃতা জনতার প্রতিনিধি সংসদ সদস্যদের বদলে দেয়। হুমায়ুনের বক্তৃতার সময় ওসমানের প্রতি ক্ষুব্ধ থাকা সদস্যরাই ভাবনা বদল করে ভিন্ন কথা বলেন, "তোমার নেতা, আমার নেতা, গণনায়ক রাষ্ট্রপিতা।" (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৬৭) জনগণের প্রতিনিধিও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার চেয়ে বুদ্ধিমানদের দ্বারা। তারা ভাবনার দরজা-জানালা খোলে না। আবার রশীদের বক্তৃতার মাধ্যমে জনতার ক্ষোভ এমন পর্যায়ে যায় যে, তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নামে নাম ছিল বলে একজন কবিকে হত্যা করে। জনতাকে তিনি দেখিয়েছেন আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং রাজনীতিবিদরা সেই আবেগকে নিজ সুবিধা অনুসারে ব্যবহার করে।

নাট্যকার 'সবিনয় নিবেদন' অংশে জানিয়ে দিচ্ছেন, উপনিবেশ থেকে নতুন স্বাধীন দেশগুলোর রাজনৈতিক চেতনা ও অভিজ্ঞতার কথাই *গণনায়ক* নাটকের বিবেচ্য। পুরো ঘটনার কেন্দ্রে থাকেন রাষ্ট্রপতি ওসমান। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ নামের জন্ম ইতিহাসের রূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়, পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের রাজনীতি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগে পাকিস্তানি সামরিক শাসক ও জমিদারশ্রেণির প্রতিভূ মুসলিম লীগ আর অন্যপক্ষে আওয়ামীলীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি। এই অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এ বিষয়ে গবেষকের মূল্যায়ন, "পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রতিনিধি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক জীবনে তিনি অব্যাহত আন্দোলন করেছেন, বহু রকমের দুর্ভোগ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং বাঙালির জাতীয়তাবাদের পক্ষে ছিলেন অনমনীয়।" (সিরাজুল, ২০১৯ : ১২৫) একাত্তরে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মূল চালিকাশক্তি ছিলেন তিনি। মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক

পরিবারে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও জনসম্পৃক্ততার কারণে জাতির প্রতীকে পরিণত হন। নাটকে রাষ্ট্রপতি ওসমানও জনগণের ভালোবাসায় দেশবন্ধু উপাধিতে ভূষিত। তার সম্পর্কে রাজনৈতিক সহকর্মী সানাউল্লাহ বলেন—

> তফাৎ এই হুমায়ুনের মতো রাজবংশেও জন্ম নয়,
> নিতান্তই কৃষকের ঘরে। নাম লিখতে কলম ভাঙে
> যে-পিতার তারই পুত্র কি না আজ সর্বজনপূজ্য?
>
> (শামসুল হক, ২০০৫ : ২২৯—২৩০)

কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়া এই রাষ্ট্রপ্রধানকে নাট্যকার দেবত্ব আরোপ না করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস নিয়েছেন। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কীর্তি ওসমান চরিত্র নির্মাণে সহায়তা করেছে।

ঐতিহ্যমুখিনতা ও দ্রোহ সৈয়দ শামসুল হকের নাটকে প্রবল, পূর্বে আলোচিত দুটো নাটকেও তা লক্ষ্য করা গেছে। *গণনায়ক*-এ মোগল শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলার বারো ভূঁইয়াদের লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছেন। অনুরূপ ৭১-এর মার্চের কালো রাতের কথা পাওয়া যায়। হুমায়ুনের সংলাপে ষড়যন্ত্র ও প্রতিরোধের তুলনামূলক আলোচনা পাওয়া যায়। একদিকে কাশিমবাজার ষড়যন্ত্রে ইংরেজের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল আর অন্যদিকে তারও পরে চট্টগ্রামে সূর্যসেন প্রীতিলতার বিদ্রোহ। একইভাবে মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা অন্যদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রতিরোধ। তিনি বাংলাদেশের মানুষের উপনিবেশবাদ বিরোধী লড়াইয়ের মাধ্যমে বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামীদের লড়াইকে তুলে এনেছেন।

নাট্যকার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। রাষ্ট্র, জনগণ ও ক্ষমতাকাঠামোই তার উপাদান। এই উপাদানসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনীতি, ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ও দেশপ্রেমকে অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা তার নাটকে রয়েছে। নাটকে ওসমানের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। জনতার পক্ষ থেকে ফুলের মালার দিয়ে বলা হয়, "দেশ মানেই তুমি, তুমিই এর কর্ণধার যতদিন জীবিত" (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৩৩)। ওসমান চরিত্রের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন দেশের একক ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপ্রধানকে তুলে ধরেছেন। জনগণের ভালোবাসা আছে বলেই তিনি আজীবন রাষ্ট্রপতি হতে চাননি। গণমানুষের সঙ্গে রাজনীতি করা নেতা জনসম্পৃক্ত থাকাকে নিজের শক্তি হিসেবে বিবেচনা করবে। নাট্যকারের অভিপ্রায় তাই। অবশ্য পরবর্তী সময়ে বিপুল জনপ্রিয় ওসমান আজীবন রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য সংসদে যান। ফলে তাঁর সহকর্মীরা ভেবেছেন ওসমান আজীবন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে গণতন্ত্র নির্বাসিত হবে রাষ্ট্র থেকে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহ সকলের হয়ে উচ্চারণ করেন, "চাই তার পতন, নয়তো সম্মুখে দুঃশীল দিন।" (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৩৬) তাঁর পতন চাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ ওসমানের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং আমৃত্যু রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে থাকার জন্য আইন পাশের উদ্যোগ। 'দুঃশীল দিন' যদি জনগণের হয় তো জনগণ এই লড়াইয়ে এগিয়ে আসবে। সানাউল্লাহ জনগণের কাছ থেকে কোনো তথ্য সংগ্রহ করছেন না। জনগণ তো তাঁকে আজীবন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব দিতে চাচ্ছে। তবে এটাও সত্য রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি জানেন যে জনগণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। জনগণকে সিদ্ধান্তের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। গণতন্ত্রের জন্য তারা যদি এই সিদ্ধান্তকে বিপজ্জনক মনে করতেন

তাহলে আলোচনা করতে পারতেন ওসমানের সঙ্গে। তারা সেটা করেননি, তার আগেই হত্যার ছক এঁকেছেন। তারা ভয় পাচ্ছিলেন, ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাদের কমে আসবে।[১৭] গণতন্ত্রের চেয়ে তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত ছিলেন। সংলাপের আশ্রয়ে নাট্যকার রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করতে চেয়েছেন। তাই হুমায়ুন উচ্চারণ করে রাজনৈতিক বাণী–

> আসলে, নেতার পতন, যখন ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয় হৃদয়,
> যুক্তির চেয়ে বড় হয় ব্যক্তিত্ব। ...
> (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৩৯)

ব্যক্তিত্ব যখন সব কিছুর চালিকাশক্তি হিসেবে দাঁড়ায় তখন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে যায়। কাঠামো কিছু সূত্র ও নিয়ম মেনে চলে। রাষ্ট্রও অনুরূপ কিছু যুক্তিকে সম্মুখে রেখে তার পরিচালন অব্যাহত রাখে। ব্যক্তিত্ব যখন যুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে যায়, নাট্যকার তার প্রমাণও রেখেছেন। ওসমান জাতীয় সংসদে না যাওয়ার কারণ সদস্যদের জানাতে চায় না। (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৪৮) ওসমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাতির কাছে প্রবল, তাই তার হত্যার পর রশীদ আলি বলে–

> তবু আমাকে শাসন করতে হচ্ছে আমার অনুভূতি,
> হাতে নিতে হচ্ছে ঘাতকের কলংকিত হাত। কাঁদো,
> বাংলাদেশ কাঁদো, তোমার মহত্তম সন্তানের
> নিষ্ঠুর বিয়োগে।
> (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৫৯)

রশীদ আলির একার শোক নয়, তা সমগ্র জাতির শোকের চিহ্ন। যিনি জাতি ও রাষ্ট্রের পুরোটা ধারণ করতে পারেন তার প্রয়াণেই পুরো রাষ্ট্র বা জাতিকে কান্নার আহ্বান জানানো যায়। ওসমান তা ধারণ করতে পেরেছেন। তাকে হত্যার চক্রান্তকারীরা জনতার ওপর আস্থা রাখেনি। তাদের ভরসা ও বিশ্বাস ছিল সীমান্ত প্রহরী, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের প্রতি। সেই ভরসায় আইন প্রণয়ন কেন্দ্র অর্থাৎ সংসদ ভবন, বেতার ভবন ও নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা নেয়। জনগণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন প্রত্যাশীরা জনগণকেই দূরে রেখেছেন।

হুমায়ুন যদিও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে লড়াইয়ে যাননি তবে জনগণের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেননি। জনতার বাইরে সীমান্ত প্রহরী প্রধান তাদের পাশে আছেন এই খবরে সহকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেন, অস্ত্র নয় যুক্তি এবং ইতিহাসের ধারায় পতন ঘটাতে হবে। (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৪৩) তবে সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হুমায়ুনেরা ছিল না। বরং তাঁকেই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনকে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে বাংলার মানুষের মুক্তিই এর লক্ষ্য। এই হত্যার ফলে যদিও হুমায়ুন পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পাচ্ছেন তারপরও সহকর্মীদের বলেন–

> বন্ধুগণ, আসুন আমরা তাঁকে হত্যা করি প্রেমের উদ্বোধনে,
> ঘৃণার দহনে নয়। হত্যা করি ব্যক্তিগত সিদ্ধির জন্যে নয়,
> জাতির সমৃদ্ধির জন্যে।...
> (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৪৫)

হুমায়ুন ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে সংশয় নিয়ে চলেছেন। তার প্রধান কারণ তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠজন। তিনি যখন হত্যার উদ্দেশ্যে ছুরি বসান তখন জুলিয়াস সিজারের মতো ওসমান বলে, "তুমি? হুমায়ুন– তাহলে এভাবেই?" (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৫৪)

ক্ষমতার রাজনীতির পথ পরীক্ষা করেছেন নাট্যকার। হুমায়ুন হত্যাকে যৌক্তিক বিবেচনা করেন এই বলে যে "রাষ্ট্রকে বাঁচাতেই রাষ্ট্রপতির উৎখাত" (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৫৭)। তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন। আবার একই বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতিকে স্নেহশীল, কীর্তিমান ও সংগ্রামী হিসেবে উল্লাস ও গৌরব প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয় হুমায়ুন জনবিচ্ছিন্ন ক্ষমতা দখলের রাজনীতির সূত্র বিষয়ে দক্ষ নন। নেতাকে হত্যার পর নেতার অনুসারী হিসেবে পরিচয় দেন তিনি। যার ফলে এই হত্যা জনতা ও তাদের প্রতিনিধির কাছে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। হত্যা পরিকল্পনার সময় সহকর্মীরা ওসমানের ঘনিষ্ঠ রশীদ আলিকে হত্যার প্রস্তাব দিলে হুমায়ুন বিরোধিতা করেন। তার মতে ওসমানের বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়ায় বড়ো হওয়া রশীদ কিছুই করতে পারবে না। এমনকি হত্যা পরিকল্পনার সময়ও তিনি রক্তপাত ছাড়া বিপ্লবের কথা ভেবেছেন। নেতার প্রতি হুমায়ুনের শ্রদ্ধা তার হত্যার পরও ম্রিয়মাণ হয়নি তাই সহকর্মীদের বিরোধিতার মুখেও রশীদকে মৃতদেহের সামনে বক্তৃতার সুযোগ দেন। তার বক্তৃতায় আবেগপ্রবন হয়ে সংসদ সদস্যরা হুমায়ুন ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে চলে যান। যার ফলে তাদের পালাতে হয়েছে। হুমায়ুন রাষ্ট্র, জনতা ও বিদ্রোহী সহকর্মী বিষয়ে সংশয়ে ভুগেছেন। তাই জনতা ও রাষ্ট্রের নামে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে থাকলেও সহকর্মীদের সমর্থন করেননি। যুদ্ধের আর্থিক প্রয়োজনে ব্যাংক ও ট্রেজারি লুট করতে দেননি। ভবিষ্যতের কথা বলে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সাবেক মন্ত্রী সানাউল্লাহ'র টাকা নেওয়ার বিরোধিতা করেন। এখানে ন্যায়বোধ, রাজনীতি, জনতা, রাষ্ট্রর সম্পর্ক অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে হুমায়ুন। দেশবন্ধুকে হত্যার পর পলাতক হুমায়ুন রাজনীতির পাঠ নিতে থাকেন। তিনিও চান জনতার সমর্থনে আদর্শ প্রতিষ্ঠা। তাই রশীদ ও জেনারেল চৌধুরীর বিরুদ্ধে তার বাহিনীর লড়াইকে আদর্শের সংগ্রাম হিসেবে মনে করেন না। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের বিবেচনায় হুমায়ুন পালাতে চান। তার এই সংশয়ের মূল্যও দিতে হয় সহকর্মীর হাতে প্রাণ দিয়ে।

রশীদ আলির বক্তৃতায় গণনায়ককে নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। তিনি গণনায়কের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ জনতার সামনে নিয়ে আসেন তা হলো–

১. বিলাস ব্যসনে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা উপভোগ করেননি।[১৮]
২. গণমানুষের সঙ্গে একাত্ম, তাদের দুঃখে নিজেও আপ্লুত হয়েছেন।[১৯]
৩. ক্ষমতাকে আকড়ে থাকতে চাননি।[২০]

গণনায়ক নাটকে নাট্যকার বলতে চেয়েছেন, রাজনীতিকদের ক্ষমতালোভই সেনা শাসনের সূচনা ঘটায়। গণনায়ককে হত্যার সঙ্গে যুক্তরা নেতাকে হত্যার জন্য সমর্থন নিয়েছিলেন জনতার প্রতিনিধি সংসদ সদস্যদের একাংশ, সীমান্তরক্ষী ও পুলিশকে। প্রধান সেনাপতিকে তারা পাশে পায়নি তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল রশীদের। প্রধান সেনাপতিও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। যে মুহূর্তে জনগণ ও সংসদ হত্যাকারীদের বিপক্ষে চলে যায় তিনি আবির্ভূত হন রাজনীতির মঞ্চে। একইসঙ্গে তিনি সকল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাকে কোনো বিচার ছাড়াই গ্রেফতার ও গুলি করে হত্যা করেন। কাশেম সেনাপতিকে অনুরোধ করেছিলেন জনরায় নিতে।

জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের পাশ কাটিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য মিথ্যাচার করে৬ কৃষক নেতা কাশেমকে হত্যা করেন। সেনাপতি যেহেতু জনপ্রতিনিধি নন, তাই জনতার পক্ষে থাকা নেতাকে হত্যা করতে ভাবিত হন না। রশীদ ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি হিসেবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে চান। জেনারেলকে দেশপ্রেমিক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "ইতিহাসে আপনার নাম লেখা হবে মহত্তম সন্তান হিসেবে" (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৮৪)। রশীদ রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার আশায় সংসদের অধিবেশন ডাকতে চান, কিন্তু জেনারেল আগের রাতেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন। রাষ্ট্রপতির বিধবা পত্নীকে সামনে রেখে সরকার গঠন। যিনি রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে জনতার কাছে প্রতীক হিসেবে থাকবেন। আড়াল থেকে ক্ষমতা পরিচালনা করা জেনারেল দেশবন্ধুর ভক্ত হিসেবে নিজেকে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। তাই ওসমানের বিধবা পত্নীর পাশাপাশি রশীদকেও সাথে রেখেছেন। সকলেই ক্ষমতার দৌড়ে ছুটছেন, কিন্তু সফলতা এসেছে জেনারেলের হাতে, তিনি কারো প্রতি অনুকম্পা দেখাননি। যেখানে ভয় কাজ করবে সেখানে ভয়ই তার অস্ত্র হয়েছে। যাকে বিপজ্জনক মনে করেছেন তাঁকে হত্যা করেছেন। *গণনায়ক* নাটকে সৈয়দ শামসুল হকের রাজনৈতিক ভাবনাগুলো হলো :

ক. ক্ষমতার রাজনীতিতে উদারতা বিপদ ডেকে আনে।
খ. বিশ্বাসভঙ্গের ফল বিশ্বাসভঙ্গ দিয়েই ঘটে।
গ. যুক্তির চেয়ে ব্যক্তিত্ব প্রধান হয়ে গেলে বিপর্যয় নেমে আসে।
ঘ. জনগণ ক্ষমতার রাজনীতিতে মূল নিয়ামক না হলেও জনতাকে সঙ্গী করতে হবে।
ঙ. রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা সামরিক শাসনকে নিশ্চিত করে।
চ. নিষ্ক্রিয় জনগণকে সক্রিয় করে তোলে রাজনীতিবিদগণ

গণনায়ক কোনো একক ব্যক্তির পতন বা নতুন কারো ক্ষমতা দখলের কাহিনি নয় বরং রাজনীতিবিষয়ক পাঠ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব রাখে ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে *এখানে এখন* নাটকটি। মানিকগঞ্জে রেললাইন বসানোর কাজ নিয়ে রফিক ও নাসিরের দ্বন্দ্ব। তারা দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, একজন অন্যজনের জন্য মদ নিয়ে আসে, ফাঁকা বাড়িতে দুজনে নারী নিয়ে ফূর্তি করে। অথচ তারা পরস্পরের অগোচরে ঠিকাদারি কাজটি পাওয়ার চেষ্টা করে। রফিক কাজ পাওয়ার বিষয়টি জানায়নি বলে নাসির ক্ষুব্ধ হয়। নাসির কাজটি পেয়েছে জেনে রফিক যন্ত্রণা পেতে থাকে। এই ব্যবসায়ী শ্রেণির উত্থানপর্বে রাষ্ট্রীয় ঘটনাকে সঙ্গী করেন নাট্যকার। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় রফিক কলকাতায় ছিল, দেশ স্বাধীনের পর রফিকের সঙ্গে অনেকের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় নাসির। যার ফলে নাসির চায় বন্ধুর সকল ব্যবসায় ভাগ থাকতে হবে তার। রফিককে স্মরণ করিয়ে দেয়, নতুন দেশে সেই তাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বাধীন দেশে ব্যবসায়ীদের একটি শ্রেণি তৈরি হচ্ছে যারা সকল কিছু বিচার করে অর্থের হিসেবে, কাজ পাওয়ার স্বার্থে– সেই ব্যবসায়ী শ্রেণির কথা তিনি বলতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে রফিকের সাথে কথোপকথনে সুলতানা বলে–

স্বাধীনতা এসেছে থেকেই দ্যাখো
মানুষের মনে স্বস্তি নেই– এ স্বাধীনতা নিয়েই।
চিনির ডেলায় তুমি কালো পিঁপড়ে ছাড়লে তো ফের
লাল পিঁপড়ে সারে সার দেখা দিচ্ছে পর মুহূর্তেই।

সেটা তো আছেই; আর, মানুষের কথা ভেবে দ্যাখো–
জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে ধাঁ ধাঁ করে, বাড়ছেই.
বাড়ছেই, গিয়ে কোথায় ঠেকেছে; কিন্তু রোজগার
সেই হারে বাড়ছে না; তারপর নিরাপত্তা নেই,
নিশ্চয়তা নেই, চুরি ডাকাতি ছিনতাই, হতে হতে
মানুষের চোখ দুটি বাকি থাকবে ছিনতাই হতে–
এরি মধ্যে কারো কারো তাও হয়ে গেছে। কিছু নয়
স্থিতিশীল, তোমাকে নতুন আর কি শোনাতে পারি?

(শামসুল হক, ২০০৫ : ১৯১)

এই কথোপকথনে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। অথচ স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল সুখী ও সমৃদ্ধশালী স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ রচনা করেন, "সত্তর দশকের তুলনায় আশির দশকে কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেই প্রবৃদ্ধি হার শ্লথতর হচ্ছে। আয়ের এই শ্লথ প্রবৃদ্ধি তাই দারিদ্র্যের মাত্রায় আনতে পারেনি তাৎপর্যপূর্ণ কোন পরিবর্তন– অর্ধেক জনগোষ্ঠী বাস করছেন 'দারিদ্র্য-সীমার নীচে এবং যারা এই সীমার ওপরে রয়েছেন তাদেরও একটি বড় অংশের কোনো স্থিরতা নেই যে দীর্ঘমেয়াদে তারা তাদের সেই অবস্থানে বজায় থাকতে পারবেন' (বিনায়ক, ১৯৯২ : ৮)। সাধারণ মানুষের এই বেদনার কথাই তুলে ধরেছেন সুলতানা। একইসঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আক্রান্ত হয়, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যবিত্ত সমাজের প্রগতিশীল অংশ ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের মধ্যে আত্মাহুতির ভেতর দিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, স্বাধীনতা লাভের পর তা অক্ষুণ্ন থাকেনি। প্রথমত যুদ্ধবিপর্যস্ত বাংলাদেশের সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা; দ্বিতীয়ত, আদর্শবাদের জোয়ার সরে যেতেই বিকৃত স্বার্থবুদ্ধির উৎকট প্রকাশ; তৃতীয়ত, লক্ষ্য অর্জিত হবার পর বিভিন্ন সমবায়ী দলের প্রতি ক্ষমতাসীন দলের অবিশ্বাস এবং ফলে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ, এসবই সংবেদনশীল শিল্পীর সত্তায় সৃষ্টির অনুকূল সাড়া জাগায়নি" (আবু হেনা, ১৯৮২ : ১৩৬)। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি ফিরিয়ে আনেন সুলতানা, তাঁর উচ্চারণ–

রাষ্ট্রপতিকে যে দেশে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে,
হয়...

(শামসুল হক, ২০০৫ : ১৯১)

স্বাধীনতার মূল ব্যক্তিকে হত্যার বেদনা নাট্যকারকে আপ্লুত করেছে। এই নৃশংস হত্যার বিষয়টি পাঠক-দর্শককে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ফলে জাতির নৈতিকতায় চিড় ধরেছে তা বোঝা যায় অনামা চরিত্রের সংলাপে। তিনি চান, রফিক তার বন্ধুত্ব, আদর্শ, নৈতিকতাকে প্রত্যাখান করে ঠিকাদারি কাজটি নেওয়ার চেষ্টা করুক। তাই তিনি বলেন–

কথা যাকে মাথায় রাখার
অবলীলাক্রমে তাঁকে মারেনি কি মানুষ বাংলার? (শামসুল হক, ২০০৫ : ২১১)

নাট্যকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলির সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনকে দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি বিশ্বের পরাক্রমশালী দুটো রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন। তারা নানাভাবে বাংলাদেশ নামক নবীন রাষ্ট্রের

পথে বাধা তৈরি করেছে। স্বাধীনতার পরপরই রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে গবেষকের ভাষ্য, "সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী দেশীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ একসাথে দেশের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু শাসক দল দেশের ভেতরে ও বাইরের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট সচেতনতা প্রদর্শন করতে পারেনি। দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেও এক্ষেত্রে শাসকদল আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসেনি।" (রঙ্গলাল, ১৯৯৭ : ৯৮) যার ফলে রাজনৈতিক হত্যা ও দেশের পরিস্থিতি বদলে যাওয়া। স্বাধীনতার অল্প সময় পরে সামরিক শাসনের ক্ষত নিয়ে রাষ্ট্রের পথচলা। বাক্‌স্বাধীনতা, জনগণকে দমিয়ে রাখার জন্য অস্ত্রের ব্যবহার। যার ফলে জনগণ বোবা দর্শকে পরিণত হয়। রফিক যেন সে অবস্থার বর্ণনাকারী–

... স্বর্গ থেকে শকুন নেমেছে।
কোটি কোটি লাশ। দেশ লোবানের ঘ্রাণে ভরে গেছে।
কান্নার আদলে কানে শোনা যাচ্ছে পবিত্র পঠন।
(শামসুল হক, ২০০৫ : ১৯২)

পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক শাসকগণ রাষ্ট্র শাসনে ধর্মকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[২২] যা শাসন ও শোষণের কাজটি সহজতর করেছে। ধর্ম যখন রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান হয়ে যায় তখন সমাজও ধর্মকে আকড়ে ধরে। রফিক শাসকদের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিয়ে সুলতানাকে বলে–

তারা জানে ভালো করে জানে–
এ জীবন থেকে যদি মানুষের মুখ
ফেরানো সম্ভব হয়, পরকাল প্রসঙ্গের দিকে,
যদি তাকে শেকড় পর্যন্ত ভীত করে তোলা যায়,
তবে নির্বিবাদে
আমাদের শোষণ শাসন আর কে বলে ঠেকায়?
(শামসুল হক, ২০০৫ : ১৯৪)

সামরিক শাসকগণ তাদের অবৈধ ক্ষমতাকে পোক্ত করার জন্য দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করেছেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের মূল অভিপ্রায় জাতিকে দৈব নির্ভর করে তোলা। যার ফলে শাসন ও শোষণের কাজটি সহজতর হয়। এ বিষয়ে গবেষকের অভিমত, "মরহুম জিয়ার কৌশলময় হস্তক্ষেপের ফলে 'বাঙালি জাতীয়তা' শতকরা পঁচাশিজন মুসলমানের স্বার্থে ভুট্টোকথিত 'মুসলিম বেঙ্গলে'র ছদ্মাবরণে বাংলাদেশী জাতীয়তায় পরিণত হয়ে একটু আড়ালের মধ্য দিয়ে তা প্রকারান্তরে দ্বি-জাতি তত্ত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, এরশাদ এক পর্যায়ে ক্ষমতা পরিপোষণের ঐ একই লক্ষ্যে আড়ালের পর্দাটুকু সরিয়ে দিয়ে 'মুসলিম বেঙ্গল' গড়ার উদ্দেশ্যেই ইসলাম ধর্মকে সদর্পে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।" (আবু জাফর, ১৯৯২ : ৫৯)

রেললাইন নির্মাণের ঠিকাদারি কাজ পাওয়ার শর্ত হিসেবেও ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। অনামা পুরুষ চরিত্রটি জানিয়ে রাখে রফিকের মসজিদের সাথে যোগাযোগের কারণে নাসিরউদ্দীনের চেয়ে ঠিকাদারির কাজটি পাওয়া সহজ হবে। সোশ্যাল কালার পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয় রফিককে, যা মুসলিম বেঙ্গল চিন্তার সাথে সাযুজ্যময়। নামাজ, রোজা,

কোরআন, হাদিসের পাঠ এবং হজ্জের আড়ালে ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির প্রয়াস। ধর্মকে ব্যবহার করে কাজ আদায় করা। মানিকগঞ্জে রেললাইনের অর্থায়ন করেছে পেট্রোডলার আয় করা রাষ্ট্রসমূহ। ধর্ম পালনের নামে সে দেশে গিয়ে রফিক মূলত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সফল করবে। ধর্ম এখানে বহিরাবরণ, এই আলোচনার পরপরই মদপানের আয়োজন করা হয়। নাট্যকার স্মরণ করিয়ে দিতে চান, ধর্ম এখানে আচরণীয় বিষয় নয় বরং উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। *এখানে এখন* নাটকে দুজন ব্যবসায়ীর ঠিকাদারির দ্বন্দ্বকে সাথি করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভাষ্য রচনা করেন।

সৈয়দ শামসুল হক রচিত নাটক চতুষ্টয় পাঠে বলা যায়, ঘটনার ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশ থাকলেও তাঁর ভাবনার ভূমি বৈশ্বিক। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে একাত্তরের বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর যেখানেই হত্যা সেখানেই স্বাভাবিক মৃত্যুর আকুতি। পাপীও চায় তার সকল পাপসহ স্বাভাবিক মৃত্যু। কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তিসংগ্রাম নয় সারা পৃথিবীর মানুষের মুক্তিই তাঁর প্রার্থনা। 'নূরলদীন' আর উত্তরবঙ্গের ব্যর্থ কৃষক বিদ্রোহের নেতা নন। একটি ব্যর্থ বিদ্রোহের পথ বেয়ে মানুষের মুক্তিসংগ্রামের প্রতীকে প্রোথিত, সেটা স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই হতে পারে। একইসঙ্গে ক্ষমতা নেতার ভেতরে অহংবোধ তৈরি করে ভুলপথে পরিচালিত করতে পারে তারও দলিল নাটকটি। *গণনায়ক* নাটকে জনপ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে জনগণের ভূমিকা ও রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতায় সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্র ক্ষমতায় আবির্ভাবকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন। এই নাটকটি রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে নাট্যকারের ভাবনাকে প্রকাশ করে। *এখানে এখন* নাটকে দুজন উঠতি ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বকে সম্মুখে রেখে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সংলাপের শরীরে নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে ধর্ম বাণিজ্যের ওপর যে প্রভাব ফেলে সে বিষয়টিও পাঠক-দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অবস্থান করে নাট্যকার দ্রোহ, স্বাধীনতার লড়াই, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং বাণিজ্যে বন্ধুত্বকে অস্বীকার ও ধর্মের ব্যবহার প্রসঙ্গ আলোচনায় মানুষের চরিত্র উন্মোচনের প্রয়াস নিয়েছেন। মানবিক সমাজ গঠনের আর্তি নাটক চতুষ্টয়ে লক্ষ করা যায়, যা তাঁর নাট্যভাবনাকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে।

টীকা

১. স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগ এবং অর্জন এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জাতিসত্তাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় জাগিয়ে তোলে। এই ধাক্কা নাটকের গায়েও লাগে। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাংলাদেশের নাটক নতুনভাবে পাখা মেলতে শুরু করে। নতুন যে ব্যাপারটি এই পর্যায়ে অবশ্যই লক্ষণীয় তা হলো, যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধা নাট্যকর্মীরা একেবারে গোড়াতেই প্রচলিত ধারার নাট্যচর্চার বাইরে অবস্থান নিলেন। বোঝা গেল তাঁরা নতুন একটা কিছু করতে চান। (আল-মামুন, ২০০৮ : ১৮৮)

২. ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানে হত্যা করা হয় ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফকে, ১৯৭৬ সালে এক সামরিক আদালতে মুক্তিযুদ্ধের ১১নং সেক্টর কমান্ডার আবু তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, ২১ জুলাই তাঁর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

৩. *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* তাঁর রচিত প্রথম কাব্যনাটক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে সৈয়দ শামসুল হক এ নাটকটি রচনা করেন।

৪. *গণনায়ক* নাটকটির ভূমি ছিল উইলিয়াম শেক্সপিয়র রচিত *জুলিয়াস সিজার* নাটকটি। এ নাটকের বিষয় একজন মহান নেতাকে তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা হত্যা করে। যায় সঙ্গে ১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাযুজ্য পাওয়া যায়।

৫. স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষের যাপিত জীবনের বিপর্যস্ত দিকগুলো নাটকের আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। একটি বিশেষ শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও নৈতিক মূল্যবোধ উপস্থাপন করেছেন এ নাটকে।

৬. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কৃষকনেতা নূরুলদীনের জীবন ও আত্মদানের কথাই *নূরুলদীনের সারাজীবন* নাটকে চিত্রিত হয়েছে।

৭. এই কাব্যনাটকে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং তৎসঞ্জাত উপলব্ধির মানসচেতনার রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে।

৮. *নারীগণ* কাব্যনাটকে পলাশী যুদ্ধের পরবর্তীকালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদ নারীদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন।

৯. একাত্তর পরবর্তী প্রজন্মের সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার করণীয়— এর কার্যকারণ বিশ্লেষণে শিল্পিত প্রতিভাষ্য উপস্থাপন করেছেন *উত্তরবংশ* কাব্যনাটকে।

১০. ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে জানুয়ারীতে রংপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নুরউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি তাদের নবাব ও 'দয়াশীল' তার দেওয়ান নির্বাচিত হন। [..] রংপুরের বিদ্রোহীদল কোচবিহার ও দিনাজপুরের প্রজাগণ তাদের অধীনে সমবেত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিল। তারা ইংরেজদের রাজস্ব কর প্রদানের নিষেধাজ্ঞা জারী করে বিদ্রোহীদের চাঁদা (ঢিংখরচা) স্থাপন করে। (লুৎফর, ১৩৮২ : ৩১)

১১. নূরলদীনকে আমি আবিষ্কার করেছি। আবিষ্কার কী পর্যায়ে পৌঁছেছে দেখো, নূরলদীন ১৭৮৩ সালে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন, আর আমার লেখা নূরলদীনের সারাজীবন ১৯৮৩ সালে এসে মঞ্চস্থ হয়। দু'শ বছর পর। নূরলদীনের কোনো নাম নিশানা ছিল না, আমাদের স্মৃতিতে ছিল না। আমি নিজেও জানতাম না। ব্যাপারটা হলো কী, বিলেতে আমি যে সাড়ে ছ'বছর কাজ করেছি বিবিসি-তে, ঐ সময়ে আমি দুটো বিষয়ে ছাত্রদের মতো পড়াশোনা করেছি– একটা হচ্ছে ভাষাতত্ত্ব, আরেকটি হচ্ছে ইতিহাস। বিবিসি-র লাইব্রেরি অত্যন্ত রিচ লাইব্রেরি। ইতিহাস বলতে আমি স্পেশালাইজ করেছি কলোনিয়াল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এবং বেঙ্গল, বিশেষ করে বঙ্গ প্রদেশ। এটা নিছক আগ্রহ– ভাবলাম যে-মাটিতে আমার জন্ম, যে-মাটির ভাষায় আমি মানুষের কথা বলছি, তাদের সম্পর্কে একটু জানি। ওখানে মস্কো থেকে প্রকাশিত দুখণ্ডে ভারতের ইতিহাস ছিল। এর ২য় খণ্ডের এক জায়গায় পেলাম যে, পলাশী যুদ্ধের মাত্র ১০/১২ বছর পরে কোম্পানির যে দালাল ছিল, ওদের লেকি বলা হতো, তো ওদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন হয় রংপুরে। আমি যেহেতু বৃহত্তর রংপুরের মানুষ, লন্ডনে বসে পড়ছি, তখন একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম। তখন খোঁজখবর করতে করতে সুপ্রকাশ রায়ের বই থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেল। তারপর আরো খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গেলাম। সেখানেও তখনকার দিনের কিছু ডকুমেন্টস পেলাম। (বিপ্লব ও হাসান, ২০০৬ : ৩০)

১২. ইতিহাস থেকে আমি পেয়েছি নূরলদীন, দয়াশীল ও গুডল্যান্ডকে; কল্পনায় আমি নির্মাণ করে নিয়েছি আব্বাস, আম্বিয়া, লিসবেথ, টমসন ও মরিসকে। নূরলদীনের আত্মা ও প্রেরণা আমি ইতিহাসের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক সংকট আমি সম্ভবপর তার ক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করে নিয়েছি। (শামসুল হক, ২০০৫ : ৫৮)

১৩. "নূরলদীনের এই বেঁচে ওঠার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এ্যাবসার্ড নাটকের মতো কাব্যনাটকে এ ধরনের নাটকীয় ঘটনায় অবতারণা বাহুল্য।" (অনুপম, ২০১০ : ১৭৫)

১৪. মৌখিক রীতিতে পরিবেশিত কবির লড়াই। লীলা, যাত্রা, পালার পৌরাণিক ও লোকপুরাণ কেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে স্ব স্ব দোহার দল কর্তৃক দু'জন গায়েনের তর্কযুদ্ধ। এ নিঃসন্দেহে নাট্যমূলক, কারণ

তর্কযুদ্ধের অন্তরালে স্তরে স্তরে দুই কবির লড়াইতে একটি কাহিনি ও কাহিনির অন্তর্গত চরিত্রের ব্যাখ্যা, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি উন্মোচিত হয়।

১৫. উত্তরবঙ্গে সিল্কের শাড়ির নাম।

১৬. নূরলদীন তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের পৌনে তিনকোটি মানুষের মধ্যে ৩৫ হাজার লোকের একটা বাহিনী গড়ে তুলেছিল ... এটা কালেক্টরের লেখায় আছে। (বিপ্লব ও হাসান, ২০০৬ : ৩১)

১৭. বলুন তবে, প্রধানমন্ত্রী, কেন সেই কালাপাহাড়/ হেটে যাবে দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পা ফেলে/ আর আমরা তাঁর পায়ের তলায় পিষ্ট হবো ক্ষুদ্র বলে? (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৩০)

১৮. নিতান্ত দরিদ্র ঘরে জন্মেও রাজার ক্ষমতা হাতে পেয়েও/ জীবন যাপন করেছেন সংসার বিমুখ সন্ন্যাসীর মতো।/ এই কী উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের লক্ষণ? (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৬৪)

১৯. মানুষের ক্রন্দন শুনেছেন, কেঁদে উঠেছেন নিজে। (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৬৪)

২০. আমি তাঁকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হবার প্রস্তাব দিই তিনবার।/ তিনবারই তিনি প্রত্যাখান করেন। এই কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা? (শামসুল হক, ২০০৫ : ২৬৪)

২১. রশীদকে আগেই জানিয়ে রাখেন পালাবার চেষ্টা করতে পারেন, কৃষক নেতা আর তাহলেই দেশপ্রেমিক সৈনিক গুলি করবে। অথচ কৃষক নেতা কাশেম সৈনিককে আগেই কুঠুরিতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। পরবর্তী দৃশ্যেই জানা যায় পালানোর অভিযোগে রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হয়েছে কৃষক নেতাকে।

২২. পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন এবং অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হয়।

সহায়কপঞ্জি

অনুপম হাসান (২০১০)। *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল-মামুন (২০০৮)। 'বাংলাদেশে নাটক রচনা : ধারা ও বিবর্তন'। *থিয়েটার*, ৩৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার। থিয়েটার, ঢাকা।

আবু জাফর (১৯৯২)। 'বাংলাদেশের বিশ বছর : সংস্কৃতি চিন্তা'। *একুশের প্রবন্ধ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৮২)। 'বাংলাদেশের কবিতা : এক'। কথা ও কবিতা। মুক্তধারা, ঢাকা।

বিনায়ক সেন (১৯৯২)। 'স্বাধীনতার বিশ বছর : অর্থনীতি চর্চা'। *একুশের প্রবন্ধ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিপ্লব বালা ও হাসান শাহরিয়ার-এর সাক্ষাৎকার (২০০৬)। 'আলাপনে সৈয়দ শামসুল হক'। *থিয়েটারওয়ালা*, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক : হাসান শাহরিয়ার। ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৩)। 'বাংলাদেশের নাটক : বছর পঁচিশ'। *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*। সম্পাদক : সাঈদ-উর-রহমান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৩৮২)। *'রঙ্গপুর জেলার ইতিহাস'* (প্রথম পর্ব)। রংপুর।

রঙ্গলাল সেন (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৯)। 'জাতি ও শ্রেণি প্রশ্নে চিন্তা ও দুশ্চিন্তা: উপমহাদেশে বাংলাদেশ'। *সমাজ, রাষ্ট্র, বিবর্তন*। সম্পাদক : আহরার আহমদ। বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

সেলিম আল দীন (১৯৯৮)। *বাঙলা নাট্যকোষ* (সংগ্রহ, সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা)। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০০৫)। *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*।, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০১৫)। *দৃষ্টিভূমিতে দীর্ঘছায়া* (কবি-সব্যসাচী সৈয়দ শামসুল হক-এর ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ)। জাতীয় কবিতা পরিষদ, ঢাকা।

Zia Hyder (1996). 'Contemporary Theatre in Bangladesh'. *Contemporary Bengali writing*. Editor : Khan Sarwar Murshid. University Press Ltd., Dhaka.